উপসংহার

উনিশ শতকের শেষপর্বে 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলন সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল বাংলার সমাজে। বিদ্যাসাগর যেমন এই আন্দোলনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তেমনি এই আন্দোলনের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন রাধাকান্ত দেব। এই আন্দোলনকে ঘিরে সেকালের বাঙালি সমাজ যেভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—এমনটা আর কোনো সামাজিক আন্দোলনে লক্ষ্য করা যায়নি। আর সেকারণেই তর্ক-বিতর্কমূলক, বাদানুমূলক, উত্তর প্রতিউত্তরমূলক একটা সাহিত্যধারা বিকশিত হয়েছিল। এবং এই সাহিত্যধারা যেমন, বৈচিত্রপূর্ণ তেমনই শক্তিশালী। সমাজের বিশিষ্টজনের দুটি সারণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

সমর্থন করেছিলেন—বর্ধমানের মহারাজ মহাতাপচাঁদ, নবদ্বীপের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, শিবানাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, কালী প্রসন্ন সিংহ, প্রমুখ,সমর্থনে পঁচিশ হাজার লোক আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল। এর বিরোধিতা করে ত্রিশ হাজার লোক, আবেদন পত্র পাঠিয়েছিল। বিরোধী পক্ষ ছিল ভারী। তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বুঝেছিলেন সমকালীন এই সমাজ সংকট। জে পি গ্রান্টের আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ আইনই সিদ্ধ হয়।

বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়ে কলম ধরেন। প্রতিপক্ষ তাঁর মত আক্রমণ করে কলম ধরেন এই সূত্র ধরে লেখা হয় বহু নাটক। নাট্যকারো দেখালেন,বিধবা সমস্যার কারণসমূহ। বাল্যবিবাহ, অসম বিবাহ, বহুবিবাহ এর অন্যতম কারণ। বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রক্ষার জন্য 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র পাণীগ্রহণ বিধবা সমস্যাকে সমাজে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। কুলীনের বহুবিবাহ প্রথা চালু থাকার কারণে কুলীন স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে বহুপত্নীর বৈধব্যদশা সমাজের সংকট ও সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। নাট্যকারেরা দেখালেন, বিধবা বিবাহ আইনত স্বীকৃতি পেলেও সাফল্য আসেনি সেভাবে। প্রথমত, স্বয়ং বিধবারাই বিধবা বিবাহে এগিয়ে আসেননি। দ্বিতীয়ত, অভিবাবকেরা বিধবা বিবাহে অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। তৃতীয়ত, অর্থলোভে এক শ্রেণীর পুরুষ বিধবা বিবাহে আগ্রহ দেখালেও তা হিতে বিপরীত হয়েছিল। চতুর্থত বিপত্নীকেরাই বিধবা বিবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন নিতান্ত দায়ে পড়ে। পঞ্চমত, ধর্মভয় মানুষের মন থেকে দূর হয়নি,

সেকারণে বিধবা বিবাহে সমাজমন তৈরি হয়ে ওঠেনি। বস্তুত, বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রথম পর্বে উদ্দিপনা পেলেও শেষ পর্বে তা মুখ থুবড়ে পড়ে।

বস্তুত 'উনিশ শতকের বাংলা নাটক ও বিধবা প্রসঙ্গ' শিরোনামের গবেষণা কাজে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি নাট্যসংলাপে বিধবাদের হৃদয় যন্ত্রণা, অসহায়তা, পুনর্বিবাহ উত্তর জীবনের সমস্যা সংকট ও মিলনের প্রতিচ্ছবি। প্রতিপক্ষের সমালোচনা, রঙ্গতামাসা, মুখোরোচক গল্প, বিরোধিতা, বৈধব্য আচার ও পরিবার জীবনের সংকট, সমাজ অনুশাসন কীভাবে নাটকের চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নাট্যসাহিত্যে তাঁর অন্বেষণ আমাদের লক্ষ্য। বিধবাদের জীবন রক্ষার তাগিদে কিভাবে বেশ্যাবৃত্তিতে গমন —তার নাট্য কাহিনী সংলাপ পরম্পরায় আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, চরিত্রের স্বগত কথনে। নাটকীয় একোক্তি ও চরিত্রের আক্ষেপ উক্তির মধ্যে বৈধব্যের জ্বালা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের বাস্তব সত্যই শতাব্দীকাল দূরে দাঁড়িয়ে আমরা অনুসন্ধান করতে চেয়েছি সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। বর্ণহিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে বিধবা নারীকে কেন্দ্র করে নানান অভিযোগ। তৈরি হয়েছে নানা প্রবাদ,—'বৌ মরে ভাগ্যবানের, বর মরে অলক্ষুণে ডাইনী'র। নারীর নিজের অজ্ঞাতে পরিণত হয় বিধবায়। কখন সে সংসার হতে আখ্যা পায়—নরখাদিকা, রাক্ষসী, ডাইনী, অপয়া, ভাতার খাকী। অকালে স্বামী হারানোর শোক যতটা-না তাকে অস্থির করে তোলে তার চেয়ে, সমাজের সর্বস্তর হতে উঠে আসা অস্বস্তিকর প্রশ্নবাণ তাঁকে বিচলিত করে, পীড়িত করে কন্টকিত করে। সমগ্র উনিশ শতকে নাটকে, প্রবন্ধে কবিতায় সাহিত্যকারেরা বার বার বলতে চেয়েছেন,—বিধবা হলে নারীর প্রবৃত্তিগুলি মারা যায় না। যৌনক্ষুধা অবদমন করে রাখা যায় না আচারের ফুল-চন্দন দিয়ে। লুকিয়ে চুরিয়ে চলে যৌন মিলন ও ভ্রূণহত্যার ব্যভিচার। সতীত্ব, শূচি সব কিছু ছারখার হয়ে যায়, যৌনতৃষ্ণার কাছে। ইন্দ্রিয় রিপু কাতরতা গীতা পাঠ দিয়ে আর একাদশী দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। কারণ কৌলিন্য প্রথার কারণে যেসব বিধবা সমাজে সংকট হিসাবে দেখা দিয়েছিল তার বেশির ভাগই ছিল বাল্য বিধবা, যৌবনের প্রাক্‌লগ্নে উপনীত বিধবা। বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরী বিধবা কিংবা যৌবনাবতী বিধবা। অসমাপ্ত যৌনসুখের উল্লাসে তাঁরা ব্যভিচার লিপ্ত হত গোপনে। স্বামীসুখ বঞ্চিতা নারীর কামনা মিথ্যে নয়। শাস্ত্র বিধান দিয়ে রিপুর তাড়নাকে অবদমন করা যায় না। ফলে খুব জরুরী ছিল বিধবার পুনর্বিবাহ। আর, এই পুনর্বিবাহের কথা নাট্যকারেরা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন তাঁদের নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে।